যায়যায়দিন
তারিখ 09 JUN 2007
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ২

ইউনিভার্সিটি নয় চাকরি বাণিজ্য কেন্দ্র

আজিজুর রহমান অনুপ ইবি

ইসলামী ইউনিভার্সিটি প্রশাসনিক দুর্নীতির ভয়াবহতায় প্রশাসনিক কার্যক্রম মুখ থুবড়ে পড়েছে। নিয়োগ বাণিজ্য, অবৈধ পদোন্নতি, অযোগ্য লোক নিয়োগ, নজির বিহীন দলীয়করণ, ঘুষ, লাল ফিতার দৌরাত্ম্য, রাজনীতি, স্থানীয় চরমপন্থীদের প্রভাবসহ নানা দুর্নীতির রাহুগ্রাসে এ ইউনিভার্সিটি দিনের পর দিন পিছিয়েই পড়ছে। শিক্ষার মান দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। ফলে যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে এ ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল তা আজো বাস্তবায়ন হয়নি। কোনো ভিসিই ভাবেননি ইউনিভার্সিটির কথা। চারদলীয় জোট সরকারের আমলেও নজির বিহীন দলীয়করণ হয়। অযোগ্য সত্ত্বেও দলীয় লোকদের গণহারে নিয়োগ দেয়া হয়। এসব নিয়োগে হত্যা মামলার আসামি ও ক্যাডাররাও নিয়োগ পেয়েছে। এ কারণেই প্রশাসনের চেইন অফ কমান্ড ভেঙে পড়েছে। নিয়োগ দিতে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে ভিসি প্রফেসর রফিকুল ইসলাম ক্যাম্পাস থেকে পালিয়ে যান।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, লোক নিয়োগ, বিভিন্ন পদোন্নতি, প্রশাসনিক পদে নিয়োগসহ সব ক্ষেত্রে নজির বিহীন দলীয়করণ করা হয়। এসব নিয়োগকে কেন্দ্র করে খোদ বিএনপিপন্থী শিক্ষকরা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি নিয়ে জিয়া পরিষদ ভেঙে জিয়া পরিষদ ও পেশাজীবী পরিষদ নামে প্রকাশ্যে বিভক্ত হয়ে পড়েন। ফলে জোট সরকার ক্ষমতায় আসার মাত্র ৪১ দিন পর ২০০১ সালের ১১ নভেম্বর ভিসি তার মেয়াদের তিন বছর বাকি থাকতেই পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। ১২ ডিসেম্বর ২০০১ সালে ভিসি হিসেবে নিয়োগ পান জামায়াতপন্থী প্রফেসর মুস্তাফিজুর রহমান। বিভিন্ন নিয়োগের জন্য ভিসির পদত্যাগ দাবিতে অবশেষে ২০০৪ সালের জানুয়ারি মাসে খোদ সরকারপন্থীরাই আন্দোলন শুরু করে। ফলে জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি ও মার্চ- এ তিন মাস লাগাতার আন্দোলন চলে। ইউনিভার্সিটির বাস ভাঙচুরসহ ক্যাম্পাস বন্ধ থাকে প্রায় তিন মাস। অবশেষে মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগেই ২০০৪ সালের ৪ এপ্রিল ভিসি প্রফেসর মুস্তাফিজুর রহমানকে অপসারণ করা হয়। ওই একই দিন ভিসি হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয় প্রফেসর রফিকুল ইসলামকে। তিনি ইসলামী ইউনিভার্সিটিকে চাকরি বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলেন। মানা হয়নি একাডেমিক ক্যালেন্ডারের নিয়মকানুনও। মেডিকালের অ্যাম্বুলেন্স ব্যবহার করা হয় দলীয় কাজে। মুমূর্ষু রোগীকেও হেঁটে মেডিকাল সেন্টারে যেতে হয়েছে। নিয়োগের দাবিতে ছাত্রদল ক্যাডাররা ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ও তাণ্ডবলীলা চালায়। চাকরি পাওয়ার জন্য মরিয়া ছাত্রদল ক্যাডাররা ইউনিভার্সিটির বাসে অগ্নিসংযোগ করে। প্রক্টর অফিস পুড়িয়ে দেয়। প্রক্টরকেও প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যার হুমকি দেয়া হয়। বিদ্যালয়ের প্রক্টর, ট্রেজারার, শিক্ষক, কর্মকর্তা, ছাত্রছাত্রী সবাই ছাত্রদল ক্যাডার ও চরমপন্থী সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়ে। ঘটনার ভয়াবহতায় ছাত্রীদের হল বন্ধ ঘোষণা করা হয়। শুধু ছাত্রদল ক্যাডারদের চাকরির দাবি সামাল দিতে ব্যর্থ হয়ে ক্যাম্পাস অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়।

জানা যায়, ২০০৬ সালের ১৮ ও ১৯ মে ১৯০তম সিন্ডিকেট সভায় ৫৩টি পদের বিপরীতে ৮৮ জনকে নিয়োগ দিয়েও ছাত্রদল ক্যাডারদের সবার চাকরি না হওয়ায় তারা মরিয়া হয়ে ওঠে। ফলে গত বছর ভিসি ১৯ মে ক্যাম্পাস থেকে পালিয়ে গিয়ে আর ফিরে আসেননি।

তাছাড়া ভিসির বিরুদ্ধে প্রায় চার কোটি টাকার চাকরি বাণিজ্যের অভিযোগও পাওয়া যায়। ১৫ অক্টোবর প্রকাশিত এক লিফলেটের মাধ্যমে ভিসির চাকরি বাণিজ্যের গোপন কথা ফাস হয়ে পড়লে ক্যাম্পাসে ব্যাপক গুঞ্জন শুরু হয়। ওই লিফলেটে বলা হয়, ভিসি পাচ সদস্যের চাকরি বাণিজ্যের একটি গোপন সিন্ডিকেট গড়ে তোলেন। পদাধিকারবলে এ কমিটির সভাপতি ভিসির স্ত্রী আর সদস্য সচিব রাজশাহী ইউনিভার্সিটির বিএনপিপন্থী শিক্ষক হাছানাত আলী। অন্য সদস্যরা হলেন ছাত্রদল সভাপতি মোমিন আর ভিসির শ্যালক রাব্বী এবং ভিসির জামাই আরিফ। এ কমিটিই বিভিন্ন চাকরিপ্রার্থীর কাছ থেকে চাদা আদায় করে আসছে। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ইসলামী ইউনিভার্সিটির ইতিহাসে রেকর্ড পরিমাণ দুর্নীতি, অনিয়ম, স্বজনপ্রীতি ও দলীয় বিবেচনায় অবৈধ নিয়োগের গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। ব্যাপক দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও দলীয় বিবেচনায় পাচ বছরে (১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল) ৩৭৪ জন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হয়। ব্যাপক হারে নিয়োগ দেয়ায় দলীয় কোন্দলের জের ধরে একাধারে দুই মাসেরও বেশি সময় ক্যাম্পাস অচল থাকে।

২ ইসলামী ইউনিভার্সিটির দুর্নীতি কাহিনী

- ✔ কোনো ভিসিই ভাবেননি ইউনিভার্সিটির কথা
- ✔ আ'লীগ-বিএনপিপন্থী কেউ কারোর চেয়ে কম নয়
- ✔ অ্যাম্বুলেন্স ব্যবহার হয় দলীয় কাজে
- ✔ সব ধরনের অপকর্ম হয় ক্যাম্পাসে

জানা গেছে, ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার সময় ইবির ভিসি ছিলেন প্রফেসর এনামুল হক। আওয়ামী লীগের অযৌক্তিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হলে আওয়ামীপন্থী শিক্ষক, কর্মকর্তা ও ছাত্রলীগ ক্যাডাররা ভিসির ওপর হামলা চালিয়ে তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়িত করে। এরপর ভিসি হিসেবে নিয়োগ পান রাজশাহী ইউনিভার্সিটির বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি ও চাপাই নবাবগঞ্জের শিক্ষক-ক্যাডার খ্যাত রসায়ন বিভাগের শিক্ষক প্রফেসর ড. কায়েস উদ্দিন। সেই থেকে শুরু হয় ইউনিভার্সিটির নানা দুর্নীতি, অনিয়ম ও নিয়োগ বাণিজ্যের মহোৎসব। ছাত্রলীগের তৎকালীন সভাপতি জোহা ও সাধারণ সম্পাদক হান্নান নিয়োগ বাণিজ্যে রাতারাতি বনে যান কোটিপতি। শিক্ষকপ্রতি দুই থেকে চার লাখ, কর্মকর্তাপ্রতি এক থেকে তিন লাখ, কর্মচারী ৫০ হাজার থেকে এক লাখ টাকা পর্যন্ত আদায় করা হয়। এসব টাকা ভাগাভাগি নিয়ে তৎকালীন ছাত্রলীগের সভাপতি রাফেলের নেতৃত্বে আওয়ামীপন্থী সন্ত্রাসীরা ড. আবদুস সাত্তারের বাসায় গুলি চালায়। নিয়োগ বাণিজ্যের কোটি কোটি টাকা হাতবদলের ঘটনা ক্যাম্পাসে ওপেন সিক্রেট হলেও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আশীর্বাদপুষ্ট মহাক্ষমতাধর কায়েস ভিসি ও ছাত্রলীগ ক্যাডারদের ভয়ে কেউ মুখ খুলতে সাহস পায়নি।

একাডেমিক ফলাফলে চারটি প্রথম বিভাগ এমনকি ফ্যাকাল্টিতে প্রথম স্থানপ্রাপ্তদের বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ দলীয় প্রার্থীদের নিয়োগ দেয়া হয়েছে। কমপিউটার সায়েন্স বিভাগে নিয়োগপ্রাপ্ত ১৩ জনের পাচজনকে (বর্তমানে গণিত বিভাগে) বিভাগের চাহিদার বাইরে ভিসির একক সিদ্ধান্তে নিয়োগ দেয়া হয়। ইউনিভার্সিটির নিয়ম-নীতি তোয়াক্কা না করে তৎকালীন ভিসি সম্পূর্ণ স্বজনপ্রীতি, অর্থ বাণিজ্য ও দলীয় বিবেচনায় এসব নিয়োগ সম্পন্ন করেন। পত্রপত্রিকায় দুই-একজনের বিজ্ঞাপন দিয়ে ১৩ জন নিয়োগের মতো ঘটনাও ঘটেছে। পাচ বছরে বিভিন্ন মেয়াদে ১১২ জন শিক্ষক, ২৭ জন কর্মকর্তা, ৮১ জন কর্মচারী (তৃতীয় শ্রেণী) ও ১৫৪ জন কর্মচারীকে (চতুর্থ শ্রেণী) সম্পূর্ণ দলীয়করণ, আঞ্চলিকীকরণ ও অর্থ বাণিজ্যের মাধ্যমে নিয়োগ দেয়া হয়েছে বলে বিভিন্ন সূত্র দাবি করছে। আইসিটি বিভাগের এক শিক্ষক তখন চাকরির জন্য শিক্ষক পদে তিনটি বিভাগে দরখাস্ত করেছিলেন। কিন্তু তিনটি বিভাগেই তাকে অযোগ্য ঘোষণা করলেও ভিসির এলাকার লোক হওয়ার সুবাদে তার চাকরিটা ভিসির সরাসরি হস্তক্ষেপে হয়ে যায়। ভিসির বাড়ি চাপাই নবাবগঞ্জে হওয়ায় সে সময়ে ইউনিভার্সিটির শিক্ষক থেকে শুরু করে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী পদে চাপাই নবাবগঞ্জের অনেক লোককে নিয়োগ দেয়া হয়। এভাবে বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক মতাদর্শে নিয়োগ দেয়া ভিসিরাই নিয়োগ আর প্রমোশন নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। তারা বেমালুম ভুলে যান একাডেমিক কার্যক্রমের কথা।